দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

# নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াই

জন্মলগ্ন হইতেই বাংলাদেশ দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিতেছে। আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা ছিল। ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতাসহ নানা প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু বাংলাদেশ কখনোই এই লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সর্বাপেক্ষা ইতিবাচক দিকটি হইল, ব্যাপক মতপার্থক্য সত্ত্বেও সামরিক-বেসামরিক, নির্বাচিত-অনির্বাচিত সকল সরকারই এই দুইটি ক্ষেত্রে বরাবরই বিশেষভাবে নজর দিয়াছে। আজ দারিদ্র্যবিমোচন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে তাক-লাগানো সাফল্য তাহা নিঃসন্দেহে সেই ধারাবাহিকতারই ফসল। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন তাহার সুনির্দিষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়াছে, তেমনি আন্তর্জাতিকভাবেও তাহা স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়াছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করিয়া স্কুলবয়সী প্রায় শতভাগ শিশুকে ইতোমধ্যে স্কুলে আনা সম্ভব হইয়াছে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ৫৮ শতাংশ অতিক্রম করিয়াছে। বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্যপীড়িত জনবহুল একটি দেশের জন্য এই অর্জন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তবে ইহা লইয়া আত্মতুষ্টিতে ভুগিবার কোনো অবকাশ নাই। কারণ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝরিয়া পড়িবার হার এখনও অতি উচ্চ। যতো শিশু স্কুলে ভর্তি হইতেছে, আর যতো শিশু সফলভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করিতেছে— উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। অন্যদিকে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী দেশে ১১ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সী নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় পৌনে ৪ কোটি। অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষই এখনও নিরক্ষর। এই বিপুলসংখ্যক মানুষকে নিরক্ষর রাখিয়া যে প্রত্যাশিত জাতীয় অগ্রগতি অর্জন কিংবা টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নহে— তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্বস্তির বিষয় হইল, সরকার বসিয়া নাই। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারি উদ্যোগ-আয়োজনের অভাব কখনোই ছিল না, তবে চাহিদার তুলনায় তাহা যে অপ্রতুল— সরকারও সেই বিষয়ে সচেতন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সরকার সম্প্রতি ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সী আরও ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতা কার্যক্রমের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি জীবনভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়া হইবে। উদ্যোগটি যে সময়োপযোগী ও অতি প্রয়োজনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে চলমান সাক্ষরতা কার্যক্রমের যেই দুর্বলতাসমূহ ইতোমধ্যে চিহ্নিত হইয়াছে এবং প্রকটভাবে জনসমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেইদিকে যথাযথ মনোযোগ দিয়াছেন কিনা আমরা জানি না। পাত্রের তলায় ছিদ্র থাকিলে সেইখানে যতো পানিই ঢালা হউক না কেন তাহার ফলাফল কী হইবে— তাহা বুঝিবার জন্য স্নাতক হইবারও প্রয়োজন পড়ে না। ছিদ্রগুলি বন্ধ করিতে হইবে। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষার নামে যুগপৎ রথ দেখা ও কলা বেচার যেই অসাধু প্রক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে দীর্ঘদিন যাবৎ— তাহাতে আসল কাজটিই যে বিফলে যাইতেছে তাহা কাহারও অজানা নহে। প্রাথমিক শিক্ষাই হউক আর বয়স্ক শিক্ষাই হউক, সরকারের পাশাপাশি এইসব ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগও উপেক্ষা করিবার মতো নহে। সেইখানে বেশকিছু ভালো উদাহরণও আছে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে ভালো উদাহরণ ও সফল অভিজ্ঞতাসমূহকে যেমন কাজে লাগাইতে হইবে, তেমনি নিশ্চিত করিতে হইবে বরাদ্দকৃত সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার। ইহার জন্য কার্যকর একটি পন্থা হইতে পারে সরকারি-বেসরকারি সুসমন্বিত উদ্যোগ এবং অবশ্যই একটি কার্যকর মনিটরিং বা তদারকি ব্যবস্থা। আমাদের জনগণের একটি অংশ নিরক্ষর হইলেও তাহাদের গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা যে বিস্ময়কর— তাহা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে। তাহারা যে অতি দ্রুত যে কোনো বিষয় রপ্ত করিতে পারে মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহারই তাহার একমাত্র উদাহরণ নহে। জনগণের এই সহজাত মেধা ও জানার স্পৃহাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো গেলে দারিদ্র্যের মতো নিরক্ষরতার অন্ধকারও বিদূরিত হইতে সময় লাগিবে না।